Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, published on January 2024, Page No. 313 - 322
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

রবীন্দ্র সাহিত্যে রূপান্তর : চিঠি থেকে কবিতা

শুভঙ্কর দে
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: subhankardey27@gmail.com

Received Date 11. 12. 2023
Selection Date 12. 01. 2024

Keyword
Rabindranath Tagore, Letter, Punascha, Poem, Transform, prose, Personal, Universal, Prose-poem.

Abstract
In the twentieth century Rabindranath Tagore concentrated into creating prose-poems. We have seen Tagore to give recognition to colloquial language in 'Sabujpatra' magazine in 1914. For example this magazine includes the novel 'Ghore Baire' Rabindranath Tagore has modified many of his writings from one form to another often. We can find a lot of his personal letters modified as poems later on. Top recipients of his letters include Indira Devi, Ranu Adhikari, Nirmal Kumar Mahalanbish, and Pratima Devi. Some of these letters have been transformed and included as poems in the 'Punascha' poetry book. This book was published in 1932 and this book opened a new horizon in the field of prose-poem. This research aims to observe how personal letters may turn into universal poems. The poetry book Punascha' has six poems transformed from letters. They are 'Natak', Fank', 'Patra', 'Sundar', 'Bicched', Basa'. We can find construction of the letter differs from the poem as letter happens to be personal whereas the poem is universal. So it is seen that the words the poet telling in the letter is not included in the poem. Every poem of 'Punascha' is prose-poem. Tagore had been experimenting with this one form of poem from a while and these prose-poems are the beautiful outcome of his experiment. Prose-poems consist of small sentences, and non-finite verbs is used widely. Eg,

"Cheleta school paliye khela korche
Hanser bacha buke chepe dhore
Pukurer dhare
Ghater upor akla bose
Somosto bikel belata"

After so many experiments he found his own way of poems. In these transformed prose-poems he has deconstructed the subject object verb sequence of Bengali grammar.

"Majhkhaner fank diye roddur asche mather upor"

In prose poems he often used poem words like -

'Nishithoratrer taraguli chire niye
Jodi har gantha jai theshe
Biswaboner dokne …'

So my main research includes a detailed discussion about the above-mentioned aspects of prose-poems modified from letter by Rabindranath Tagore.

Discussion

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর অনেক রচনাকে বিভিন্ন সংরূপে রূপান্তর করেছেন। যেমন - কবিতা থেকে গান, গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক ইত্যাদি। তবে তিনি যে রূপান্তরের ক্ষেত্রে শুধু গল্প, উপন্যাস, নাটকেই থেমে গেছেন তা নয়, ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অনেককে অজস্র চিঠি লিখতেন যার প্রমাণ আমরা চিঠিপত্রের বিপুল সংখ্যক খণ্ডগুলিতে পেয়ে থাকি। সেই চিঠির অনেক চিঠিকে তিনি সাহিত্যে কবিতার আকারে রূপান্তরিত করে স্থান দিয়েছেন। তিনি যাঁদের চিঠি লিখতেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন নারী ছিলেন সবথেকে বেশি প্রাপ্যাধিকারী— ইন্দিরা দেবী, রাণু অধিকারী, নির্মলকুমারী মহলানবিশ এবং প্রতিমা দেবী। ইন্দিরা দেবীকে লেখা (১৮৮৭ সেপ্টেম্বর-১৮৯৫ ডিসেম্বর) দুশো-বাহান্নটি চিঠি নিয়ে একত্রে সংকলিত করে প্রকাশিত হয় 'ছিন্ন পত্রাবলী' (১৯৬৭ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থ। রাণু অধিকারীকে লেখা প্রায় দুশো আটটি চিঠির মধ্যে উন্নষাটটি চিঠি নিয়ে প্রকাশিত হয় 'ভানুসিংহের পত্রাবলী'(১৩৩৬ বঙ্গাব্দ)। অন্যদিকে 'পথে ও পথের প্রান্তে' (১৩৪৫ বঙ্গাব্দ) বইতে যে চিঠিগুলি রয়েছে তা সব নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা চিঠি।

রবীন্দ্রনাথ চিঠির রূপান্তর পদ্য ও গদ্য দুই ফর্মের কবিতাতেই করেছেন। তবে বেশিরভাগটাই গদ্য আকারে পাওয়া যায়। আমি 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্যকবিতার কয়েকটি কবিতাকে নিয়ে দেখানোর চেষ্টা করেছি কীভাবে চিঠি থেকে কবিতায় কবি রূপান্তর করেছেন এবং তা কতখানি ব্যক্তিগত থেকে সার্বজনীন হয়ে উঠতে পেরেছে। আমরা জানি সাহিত্যে গদ্য কবিতা নিয়ে যে চর্চা শুরু হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথমে তা সমর্থন না করলেও বার্ধক্যে এসে তিনি কিন্তু গদ্য কবিতা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু করেন। তার ফলপ্রসূত আমরা পাই ১৯৩২ সালে প্রকাশিত 'পুনশ্চ' কাব্যে। 'পুনশ্চ' কাব্যে পঞ্চাশটি কবিতার মধ্যে ছ'টি কবিতা পাই যা পূর্বে চিঠি আকারে ছিল, পরে কবি সেই চিঠির রূপান্তর কবিতা আকারে কাব্যে স্থান দেন। ছ'টি কবিতার মধ্যে পাঁচটি কবিতা হল— 'নাটক', 'পত্র', 'ফাঁক', 'সুন্দর', 'বিচ্ছেদ'। এই পাঁচটি কবিতার পূর্ব রূপ যে পাঁচটি চিঠি রয়েছে সেগুলি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে লেখা। অন্যদিকে 'বাসা' নামক কবিতাটি যে চিঠি থেকে রূপান্তরিত সেই চিঠি কবি তাঁর পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে লিখেছিলেন। গদ্য চিঠি থেকে গদ্য কবিতার যে সংরূপ ধরা পড়ে তার বিশ্লেষণ আলোচনা করেছি।

> "আমার চিঠিতে আমি নিজের মনের ঝোঁকে বকে গিয়েচি। বকবার সুযোগ পেলেই আমি বকি, এবং বকতে পারলেই আমি নিজেই মনকে চিনি এবং তার বোঝা লাঘব করি—সাহিত্যিক মানুষের এইটেই হচ্চে ধর্ম।..."[১]

এই কথা রবীন্দ্রনাথ ৮ বৈশাখ, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে নির্মলকুমারী মহলানবিশকে একটি চিঠিতে লিখেছেন। নির্মলকুমারী মহলানবিশকে কবি প্রায় অর্ধসহস্র চিঠি লিখেছেন। রবীন্দ্রচিঠিতে 'রাণী' সম্বোধনে সম্বোধিত নির্মলকুমারিকে লেখা চিঠি থেকে যে পাঁচটি কবিতা 'পুনশ্চ' কাব্যে রয়েছে, তার মধ্যে প্রথম হল—'নাটক' কবিতা।

২৩ শ্রাবণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে নির্মলকুমারীকে কবি একখানা চিঠি লেখেন। চিঠির শুরুর কিছু অংশ হল—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"কল্যাণীয়াসু,

পুত্র সন্তান লাভ হলে সে সংবাদ খুব উৎসাহ করে প্রচার করা হয়। গতকল্য আমার লেখনী একটি সর্বাঙ্গসুন্দর নাটককে জন্ম দিয়েচে— দশমাস তার গর্ভবাস হয়নি, বোধ করি দিন দশকের বেশি সময় নেয়নি।..."[২]

এই চিঠিটি লেখার তিন বছর পর ৯ ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'নাটক' নাম দিয়ে একটি কবিতা লেখেন, যা উক্ত চিঠির রূপান্তরিত। কবিতাটি শুরু হচ্ছে—

"নাটক লিখেছি একটি
বিষয়টা কী বলি।
অর্জুন গিয়েছেন স্বর্গে,
ইন্দ্রের অতিথি তিনি নন্দনবনে।
উর্বশী গেলেন মন্দারের মালা হাতে
তাঁকে বরণ করবেন বলে।..."[৩]

চিঠি ও কবিতা দুটিকে লক্ষ করে দেখবো, রবীন্দ্রনাথ চিঠিটা যেভাবে লিখেছেন, সেভাবে কিন্তু কবিতাটি লেখেননি। অথচ দুটিই গদ্যে রচিত। এখানেই চিঠি ও কবিটার দুই আলাদা ফর্ম তৈরি হচ্ছে। চিঠি হল ব্যক্তিগত জীবনের কথা বলার একটি মাধ্যম, কিন্তু কবিতা সর্বসাধারণের বিষয়। তাই কবিতা-পাঠকের বিস্তার সীমাহীন, আর চিঠির পাঠক প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সুতরাং, দেখা যায় যে, কবি চিঠিতে যা কিছু যেভাবে বলেছেন, তার অনেক কথা কিন্তু কবিতায় বলেননি। কবিতায় অনেক শব্দ-বাক্যের সংযোজন-বিয়োজন ঘটিয়েছেন। যেমন, চিঠির একজায়গায় লিখেছেন—

"ঠিক এইখানটাতে খুব একটা ঘুমের বেগ এসে পড়ল মাথার মধ্যে— হঠাৎ প্রবল বর্ষণে যেমন চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা নেমে আসে সেই রকমটা, বুদ্ধিটা একেবারেই স্বচ্ছ রইল না। অনেক সময়ে তৎসত্ত্বেও যে কাজটা হাতে নেওয়া গেছে সেটা আমি জোর করে সেরে ফেলি– টলমল করতে করতেই লেখা চলে— কষে মদ খেয়ে নাচতে গেলে যে রকমটা হয়।..."[৪]

এই কথাগুলিই যখন 'নাটক' কবিতাতে বলেছেন তখন শব্দ-বাক্যের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে কাব্যিক ভঙ্গিমায় বিচিত্র বর্ণনা। যেমন -

"এইখানটায় একটুখানি তন্দ্রা এল।
হঠাৎ বর্ষণে চারদিক থেকে ঘোলা জলের ধারা
যেমন নেমে আসে, সেইরকমটা।
তবু ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে,
যেমনটা হয় মদ খেয়ে নাচতে গেলে।..."[৫]

এখানে দেখতে পাই যে, চিঠিতে 'ঘুম' শব্দটির পরিবর্তে কবিতায় 'তন্দ্রা' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। আবার চিঠির একটি বাক্য "টলমল করতে করতে লেখা চলে" — এটির রূপান্তর ঘটেছে কবিতায় এইভাবে— "তবু ঝোঁকে ঝোঁকে উঠে টলমল করে কলম চলছে"। এখানে কবিতার স্বরূপ যেমন ফুটে উঠেছে, তেমনি শব্দের, ছন্দের অনুরণন বেজে চলেছে, তাই এটি গদ্য চিঠি থেকে হয়ে উঠেছে গদ্য কবিতা। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গদ্য-ছন্দের কথা বলতেই হয়। যে গদ্য-ছন্দে কবিতা রচনা করলেন 'পুনশ্চ' কাব্যে। 'নাটক' কবিতাটির শেষের দিক বলেছেন—

"বন্ধুদের ফর্মাশ-ভাষা হওয়া চাই অমিত্রাক্ষর।
আমি লিখেছি গদ্যে।..."[৬]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই 'পুনশ্চ' কাব্যের ভূমিকায় যা বলেছেন তা স্মরণযোগ্য—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "গীতাঞ্জলির গানগুলি ইংরেজি গদ্যে অনুবাদ করেছিলাম। এই অনুবাদ কাব্যশ্রেণীতে গণ্য হয়েছে। সেই অবধি আমার মনে এই প্রশ্ন ছিল যে, পদ্যছন্দের সুস্পষ্ট ঝংকার না রেখে ইংরেজিরই মতো বাংলা গদ্যে কবিতার রস দেওয়া যায় কিনা।..."[৭]

গদ্য কবিতার ফর্ম নিয়ে বহুদিন ধরেই রবীন্দ্রনাথ চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। আসলে গদ্য কবিতার ক্ষেত্রে যেহেতু অনিয়মিত এবং গদ্যে যেহেতু বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বাক্য থাকতে পারে তাই এমনভাবে তাকে সাজাতে হবে যাতে তার মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে কবিতার স্বরূপ, তা যেন হয়ে উঠতে পারে সর্বজনগ্রাহ্য। তাই বলতে পারি, যে চিঠি কবিতায় রূপান্তরিত হওয়ার আগে ছিল কেবল 'সাবজেকটিভ', তাইই কবিতার আকার নিয়ে 'অবজেকটিভে' পরিণত হল এবং চিঠি কবিতায় পরিণত হয়ে তা হল সর্বজনগ্রাহ্য।

২

১৫ শ্রাবণ, ১৩৩৬ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মলকুমারীকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন, সেই চিঠির প্রথমেই 'বর্ষামঙ্গলের গান' এর উল্লেখ আছে—

"ঝড় নেমে আয়, আয়রে আমার
শুকনো পাতার ডালে—
এই বরষায় নবশ্যামের
আগমনের কালে।..."[৮]

তাহলে দেখতে পাই যে, চিঠিতে কবি শুধু মাত্র ব্যক্তিগত জীবনের কথা ছাড়াও কবিতা, গান, নাটকের কথাও অবারিতভাবে চলে আসতো। আলোচ্য এই চিঠিকেই কবি 'পত্র' নাম দিয়ে ১০ভাদ্র, ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে কবিতার আকারে রচনা করেন। কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে—

"তোমাকে পাঠালুম আমার লেখা,
এক-বই-ভরা কবিতা।
তারা সবাই ঘেঁষাঘেঁষি দেখা দিল
একই সঙ্গে এক খাঁচায়।
কাজেই আর সমস্ত পাবে
কেবল পাবে না তাদের মাঝখানের
ফাঁকগুলো।..."[৯]

এখানে কবি প্রথমেই জানিয়ে দিচ্ছেন যে, পূর্বে চিঠিতে প্রাপককে কী লিখে পাঠিয়েছিলেন। ফলে যে চিঠি সাবজেকটিভ ছিল তা কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে তা হয়ে উঠল অবজেকটিভ।

প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করা দরকার যে, উক্ত চিঠিতে লেখক প্রকৃতির যে নক্সা এঁকেছেন, কবিতায় সেই নক্সাকে আরও বিচিত্র বর্ণনার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। তুলনা করে দেখানোর চেষ্টা করলাম। চিঠিতে একজায়গায় কবি লিখেছেন—

> "আকাশের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে হার গাঁথলে সেটা বিশ্ববেনের বাজারে দামী জিনিস হতেও পারে কিন্তু রসিকেরা জানে যে, ফাঁকা আকাশটাকে তৌল করা যায় না বটে কিন্তু ওটা তারাটির চেয়ে কম দামী নয়। আমার মতে যেদিন একটি গান দেখা দিলে সেইদিনই তাকে স্বতন্ত্র অভ্যর্থনা করে অনেকখানি নীরব সময়ের বুকে একটিমাত্র কৌস্তভমণির মতো ঝুলিয়ে দেখাই ভালো।..."[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চিঠির এই অংশটিই কবিতা আকারে লিখেছেন খণ্ড খণ্ড বাক্যে নতুন নতুন শব্দ যোজন করে। আর তারই ঔজ্জ্বল্যে এই বাণী আর চিঠির বাণী থাকে না, তা কবিতার কথা হয়ে উঠে যা বিস্তার লাভ করে সর্বসাধারণের মধ্যে—

"নিশীথরাত্রের তারাগুলি ছিঁড়ে নিয়ে
যদি হার গাঁথা যায় ঠেসে,
বিশ্ববেনের দোকানে
হয়তো সেটা বিকোয় মোটা দামে—
তবু রসিকেরা বুঝতে পারে
যেন কমতি হল কিসের।
যেটা কম পড়ল সেটা ফাঁকা আকাশ—
তৌল করা যায় না তাকে,
কিন্তু সেটা দরদ দিয়ে ভরা।..."[১১]

তিনি গদ্যের নিজস্ব ফর্ম তৈরি করে গদ্য-কবিতা লিখেছেন। এ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশ এর একটি কথা স্মরণযোগ্য—

> "গদ্যের পর্ববিভাগ যেহেতু অনিয়মিত, তার যতিপতন কৌশল সেজন্যই সরল এবং সেজন্যই তার ছন্দস্পন্দন বৈচিত্র্যময়।..."[১২]

তাই রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার গঠনে দেখা যায়, ছোটো ছোটো বাক্যে বা পদগুচ্ছের সমান্তরালতায় গদ্যকবিতা সৃষ্টি, যার মধ্য দিয়েই গদ্যে পদ্যছন্দের ঝংকার আনা কিছুটা সম্ভবপর হয়ে উঠেছে। তবে ছন্দই প্রধান নয়, কেননা কবি জানিয়েছেন যে, ছন্দটা রসের পরিচয় দেয় তার আনুষঙ্গিক হয়ে।

তাই বলা যায় যে, চিঠি পড়ে আমরা যে পত্র সাহিত্যের রস আস্বাদন করি, তেমনি চিঠি থেকে রূপান্তরিত কবিতা পাঠ করেও রস উপভোগ করি এবং উপলব্ধি করতে পারি চিঠির বক্তব্য।

৩

'ফাঁক' কবিতার রচনাকাল ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ। এই কবিতার বিষয়বস্তুও দু'বছর আগে নির্মলকুমারীকে ২৭চৈত্র, ১৩৩৭ বঙ্গাব্দে লেখা চিঠির গদ্য চিত্ররূপ। চিঠির একটা অংশে রয়েছে—

> "বেলা দ্বিপ্রহর, আকাশ ঝাঁ ঝাঁ করচে, মাঠ ধু ধু করচে, তপ্ত বালি হু হু করে উড়ে যায়, কিছুই খেয়াল হয় না।..."[১৩]

এ যেন গদ্য-কবিতারই চিত্ররূপ। তবে চিঠি ও কবিতার মধ্যে পার্থক্য লক্ষণীয়। চিঠির একস্থানে কবি লিখেছেন—

> "যোগাযোগ লেখা উচিত ছিল কিন্তু খামকা বাজে ছবি লিখতে বসে গেলুম— মাঝে মাঝে ঘরের মধ্যে উঁকি মেরে অমিয় হতাশ হয়ে ফিরে যায়।..."[১৪]

এখানে 'যোগাযোগ', 'অমিয়' নামদুটি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। সেই উপন্যাসের কথায় চিঠিতে উল্লেখ যেমন করেছেন, তেমনি কবির ঘনিষ্ট স্নেহের অমিয় চক্রবর্তীর নামও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'ফাঁক' কবিতায় কোথাও এ নামদুটি উল্লেখ করেননি। এখানে ব্যক্তিগত চিঠি যা সাবজেকটিভ তাই যখন অবজেকটিভে পরিণত হয়, তখন অনেক কিছু বিয়োজন ঘটে। এছাড়াও কবিতার মধ্যে একজায়গায় পাই –"বেহারা এসে খবর নেয়— 'চিটঠি'?" চিঠিতে কিন্তু বেহারার উল্লেখ পাওয়া যায়না। গদ্য কবিতায় অসমাপিকা ক্রিয়ার বিচিত্র ব্যবহারে সুদীর্ঘ বাক্যের উদাহরণ দেখা যায়। যেমন—

"...ছেলেটা ইস্কুল পালিয়ে খেলা করছে
হাঁসের বাচ্চা বুকে চেপে ধরে
পুকুরের ধারে
ঘাটের উপর একলা ব'সে
সমস্ত বিকেল বেলাটা।..."[১৫]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

রবীন্দ্রনাথ গদ্যকবিতা লেখার জন্য দীর্ঘ প্রচেষ্টা করেছেন। অনেক ভাঙ্গা-গড়ার পর তিনি নিজস্ব একটা ছক তৈরি করতে পেরেছেন। শিশিরকুমার দাশের একটি মন্তব্য এখানে প্রযোজ্য—

> "রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দীর্ঘদিন ধরে চলছিল প্রচলিত ছন্দের সুনিরুপিত রূপগুলিকে ভাঙার চেষ্টা। সেই ছন্দোমুক্তির পরিণাম গদ্য কবিতায় 'পুনশ্চ' কাব্যে যার শুরু"। [১৬]

চিঠি ও কবিতার মধ্যে আরও একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য তা হল, চিঠি যেহেতু প্রেরক ও প্রাপকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে, তাই চিঠির মধ্যে 'আমি', 'তোমার ইত্যাদি সম্বোধনসূচক সর্বনাম ব্যবহার থাকে। কিন্তু সেই চিঠি যখন কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে যায় তখন কবি সচেতনভাবেই সম্বোধনগুলি বর্জন করেছেন। যার জন্য কবিতা হয়ে উঠেছে সর্বসাধারণের, কবির কথা পৌঁছে যাচ্ছে বিশ্বদরবারে।

৪

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ, ৩২ আষাঢ়। এক ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্মলকুমারী দেবীকে একখানা চিঠি লেখেন— যা আখ্যানধর্মী রচনা বললে কিছুমাত্র ভুল হবে না। চিঠির শুরুটাই হয়েছে আখ্যানের ঢঙে—

> "প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে— আকাশের দিগন্ত ঘিরে মেঘ জমেচে, তার মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদ্দুর পড়েচে এসে পরিপুষ্ট শ্যামল পৃথিবীর উপরে। আজ আর বৃষ্টি নেই— হু হু করে হাওয়া দিচ্চে, সামনে পেঁপে গাছের পাতা কাঁপচে।..."[১৭]

এই চিঠির ভাষ্য রূপান্তর করে ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ৭ভাদ্র 'সুন্দর' নামে কবিতা লিখলেন। কবিতার শুরুও চিঠির শুরুর বাক্য দিয়েই—

> "প্লাটিনমের আঙটির মাঝখানে যেন হীরে।
> আকাশের সীমা ঘিরে মেঘ;
> মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদদুর আসছে –
> মাঠের উপর।..."[১৮]

গদ্য ছন্দের উপর নির্ভর করে কবিতা রচনা করেছেন বলেই ছন্দের যেন একটা খামতি থেকে যাচ্ছে, আর সেটিই পূরণ করেছেন আখ্যান বর্ণনার মাধ্যমে চিত্রপট তৈরি করে। এখানেই বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতার ফর্মটিকে ঠিকভাবে ধরতে পেরেছিলেন। তাই দেখি যে, শান্তিনিকেতনের ছাত্র নিশিকান্ত রায়চৌধুরী যখন গদ্য-কবিতা লিখছেন তখন রবীন্দ্রনাথ সেই গদ্য-কবিতাগুলি সংশোধন করে দিয়ে 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ছাপাতে দিতেন। তাই বলা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের গদ্যকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে গদ্য-কবিতা এবং তা যথাযথ চলিত গদ্য-কবিতা।

আমরা জানি ১৯১৪ সালে 'সবুজপত্র' পত্রিকার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে চলিত ভাষাকে স্বীকৃতি দেন। তাই ১৯১৬ সালে তিনি সম্পূর্ণ চলিত ভাষায় উপন্যাস, কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন।

চলিত গদ্যের জন্য বাংলা বাক্যের বহুল প্রচলিত স্বাভাবিক ক্রম কর্তা-কর্ম-ক্রিয়াকে রবীন্দ্রনাথ গদ্য-কবিতায় লঙ্ঘন করলেন। যেমন— "মাঝখানের ফাঁক দিয়ে রোদদুর আসছে মাঠের উপর", "জুড়ে বসেছে আমার সমস্ত মন" ইত্যাদি।

আসলে গদ্য যখন কবিতামুখী হয় তখন সেই গদ্যের অন্বয়কে কিছুটা বদলাতে হয়। বিশেষ করে পদ্যের ছন্দকে যেহেতু গ্রহণ করা যায় না, সেজন্য গদ্যছন্দকে এমনভাবে নিরুপিত করেন কবি, ফলে পদ্যছন্দের কাছাকাছি আসতে পারে গদ্য-কবিতা। এ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশের মন্তব্য স্মরণীয়—

> "রবীন্দ্রনাথ পদ্যের ছন্দের বন্ধন ভেঙ্গে তাকে গদ্যমুখী করার কথা ভাবেননি, ভেবেছিলেন ঠিক তার উলটো, 'গদ্য'কে নিয়ে যাওয়া কিনা পদ্যের দিকে।..."[১৯]

তাই রবীন্দ্রনাথ তার গদ্যচিঠিকে রূপান্তরিত করেছেন গদ্যকবিতায়। তাঁর সৃষ্ট চিঠি ও কবিতাগুলিকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে আমরা ধরতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-চিন্তার পরিবর্তন ঘটেছে কেমনভাবে, এমনকি তাঁর চিঠির

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যে কথোপকথনে যে অল্পপ্রাণ ধ্বনির প্রভাব তা লক্ষ করি। যেমন এই পত্রে আলোচ্য চিঠির সবজায়গায় 'ছ' বর্ণের স্থলে 'চ' বর্ণ লিখেছেন। যেমন— 'জমেচে', 'পড়েচে', 'কাঁপচে'। আসলে এটা চিঠি এবং তার সীমাবদ্ধ দুজনের মধ্যে বলেই কবি মুখের কথাই লিখেছেন। কিন্তু এই চিঠিই যখন কবিতার আকারে প্রকাশ পাচ্ছে তখন কবি সচেতনভাবে অল্পপ্রাণের জায়গায় মহাপ্রাণ লিখেছেন—'আসছে', 'বইছে' ইত্যাদি।

পরিশেষে বলবো যে, চিঠি ও কবিতা দুইই ভিন্ন জাতের সাহিত্যরূপ। চিঠি যখন চিঠির অবস্থানে রয়েছে তখন তার সাহিত্যগুণ একরকম, আবার চিঠি যখন কবিতায় রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে তখন সেই কবিতার গুণ ও আবেদন চিঠির থেকে অনেক গুণ বেশি ও উৎকৃষ্ট হয়।

৫

১৩৩৬ বঙ্গাব্দ ৮ শ্রাবণ নির্মলকুমারীকে লেখা চিঠিতে ব্যক্তিগত কথার পাশাপাশি শ্রাবণে ভরা বর্ষায় মেতে ওঠা প্রকৃতির কথাও বলেছেন। সেই সূত্রে তিনি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যের প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন। তার কিছু অংশ হল—

> "মেঘদূত যেদিন লেখা হয়েছিল সেদিন পাহাড়ের উপর বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল। সেদিনকার নববর্ষায় আকাশে বাতাসে চলার কথাটাই ছিল বড়ো। দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছুটেছিল মেঘ, পুবে হাওয়া বয়েছিল 'শ্যামজম্বুবনান্ত' কে দুলিয়ে দিয়ে, যক্ষনারী বলে উঠেছিল, মাগো, পাহাড়সুদ্ধ উড়িয়ে নিলে বুঝি।..."[২০]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘায়ু সাহিত্য জীবনে মহাকবি কালিদাসের 'মেঘদূত' কাব্যকে নিয়ে বহুবার আলোচনায় সম্পৃক্ত হয়েছেন, এই কাব্যকে অবলম্বন করে কাব্যের প্রতি অনুরাগ ও মহাকবিকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন কবিতা, প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে। তাঁর প্রথম জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে 'মেঘদূত' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা পাই যা 'মানসী'(১৮৯০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত। আবার 'মেঘদূত' নামে তিনি যে প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেখানে রামগিরি পর্বতে নির্বাসিত যক্ষের সঙ্গে অলকাপুরীতে স্থিতা প্রেয়সীর বিরহকল্পনা কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছে প্রাচীন ও বর্তমানকালের ব্যবধান ও শেষ পর্যন্ত মানুষের সঙ্গে মানুষের মধ্যকার ব্যবধানহেতু গড়ে ওঠা একাকীত্ব বোধকে তুলে ধরেছেন।

সুতরাং কবির এই চিঠির ভাষ্য রূপান্তর হিসেবে আমরা পেয়ে থাকি 'বিচ্ছেদ' নামের কবিতাটি। কবিতাটির রচনাকাল চিঠির রচনার সময়কাল থেকে তিন বছর পর ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে ভাদ্র মাসে। কবিতার শুরু হচ্ছে—

> "আজ এই বাদলার দিন
> এ মেঘদূতের দিন নয়।
> এ দিন অচলতায় বাঁধা।..."[২১]

আলোচ্য চিঠির মধ্যে সেভাবে বর্ণনার ঘনঘটা না থাকলেও তা যখন কবিতায় রূপান্তরিত হয়েছে তখন কবিতার ছত্রে ছত্রে পাই শব্দের ঝংকার। যেমন একটি স্তবকে কবি লিখেছেন—

> "সেদিনকার পৃথিবী জেগে উঠেছিল
> উচ্ছল ঝর্ণায়, উদবেল নদী স্রোতে,
> মুখরিত বনহিল্লোলে,
> তার সঙ্গে দুলে দুলে উঠেছে
> মন্দাক্রান্তা ছন্দে বিরহীর বাণী।
> একদা যখন মিলনে ছিল সমস্ত বিশ্বে,
> বিচিত্র পৃথিবীর বেষ্টনী পড়ে থাকত
> নিভৃত বাসরকক্ষের বাইরে।..."[২২]

কবি গদ্য-কবিতাকে এমনভাবে উপস্থাপনা করেছেন যার ফলে আমাদের কানে বার বার অনুরণিত হয় 'পদ্যছন্দের অনতিস্পষ্ট ঝংকার' এর মতো। এছাড়া চিঠি ও কবিতার মধ্যে আরও এক জায়গায় ব্যবধান রয়ে যায়। আমরা দেখি যে, আলোচ্য চিঠির শেষ অংশে লিখেছেন—

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - i, January 2024, tirj/January 24/article - 37
Website: https://tirj.org.in, Page No. 313 - 322
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...বাদলের দিনে মেঘদূতের দিন নয় এ যে অচলতার দিন— মেঘ চলচে না, হাওয়া চলচে না, বৃষ্টি যে চলচে তা মনে হয় না, ঘোমটার মতো দিনের মুখ আবৃত করেচে, প্রহর চলচে না, বেলা কত হয়েচে বোঝা যায় না।..."[২৩]

এখানে কবি একান্তভাবেই ব্যক্তিগত ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা বলেছেন অনাবৃতভাবে। কিন্তু একথা কবিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না বলেই তিনি 'বিচ্ছেদ' কবিতার শেষে লিখেছেন—

> "...সেও তো নেই স্থির হয়ে যে পরিপূর্ণ,
> সে যে বাজায় বাঁশি, প্রতীক্ষার বাঁশি
> সুর তার এগিয়ে চলে অন্ধকার পথে।
> বাঞ্ছিতের আহ্বান আর অভিসারিকার
> চলা পদে পদে মিলছে একই তালে।..."[২৪]

গদ্যচিঠির রূপান্তরিত গদ্য-কবিতা একদিকে যেমন কবিতার পরিপূর্ণতা পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে কবিতাটির আবেদন নাটকমহলে বিশেষ মূল্যের দাবী রাখে।

৬

পুত্রবধূ প্রতিমা দেবীকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক চিঠিই লেখেন, তার মধ্যে একটি সময়কাল ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ অগাস্ট। এই চিঠিই পরে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে, ৩ভাদ্র 'পুনশ্চ' কাব্যে 'বাসা' নামের কবিতায় রূপান্তরিত হয়। চিঠির শুরুর কিছু অংশ হল—

> "...ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে শালবনের ছায়ায়, খোলা জানলার কাছে। বাইরে একটা তালগাছ খাড়া দাঁড়িয়ে, তারই পাতাগুলোর কম্পমান ছায়া সঙ্গে নিয়ে রোদদুর এসে পড়েচে আমার দেয়ালের উপর, জামের ডালে বসে ঘুঘু ডাকচে সমস্ত দুপুরবেলা, নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি চলে গেছে— কুড়চি ফুলে ছেয়ে গেছে গাছ, বাতাবি লেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠেচে,...নদীতে নেবেচে একটা ছোটো ঘাট, লাল পাথরে বাঁধানো; তারই একপাশে একটা চাঁপার গাছ।..."[২৫]

চিঠি পাঠের মধ্যে বোঝা যায় কত বিচিত্র বর্ণনায় পরিবেশের ছবি কথা বলেছেন। আসলে রবীন্দ্রনাথ চিঠির পাঠককে একজন সুরুচি পাঠক ভেবেই চিঠির মধ্যে ব্যক্তিগত কথা ছাড়াও পল্লী-বাংলার কথা, ছবির কথার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। পরে এই চিঠি যখন কবিতার রূপ পেল তখন কবিতার পাঠক এক অন্য স্বাদের আস্বাদন পেল— যে আস্বাদ গদ্যকবিতার মধ্যে আখ্যানের ঢঙে গল্প শোনার আস্বাদ।

তবে আলোচ্য চিঠির সঙ্গে কবিতার তাৎপর্যের ব্যবধান রয়েছে। চিঠিতে যে কথা খোলসা করে বলেছেন, কবিতায় তা রূপকের মোড়কে বলেছেন। যেমন, কবিতার প্রথম স্তবকেই পাই—

> "ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে
> আমার পোষা হরিণে বাছুরে যেমন ভাব
> তেমনি ভাব শালবনের আর মহুয়ায়।
> ওদের পাতা ঝরছে গাছের তলায়,
> উড়ে পড়ছে আমার জানলাতে।..."[২৬]

কবিতার এই স্তবকের মধ্যে 'হরিণ', 'বাছুর', 'মহুয়া' শব্দগুলি আসলে রূপকার্থে ব্যবহৃত। কবিতা যেহেতু অবজেকটিভ তাই নতুন শব্দ যোজনার মধ্য দিয়ে উপমা সৃষ্টির প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। যার দরুণ কবিতাটি চিঠি থেকে ভিন্ন হয়ে নতুন রসের জোগান ঘটিয়েছে পাঠকের মনে।

গদ্য-কবিতার প্রবহমানতা দীর্ঘ স্রোতের মতো, যুগের প্রয়োজনেই গদ্য-কবিতার জন্ম এবং কবিতারূপই যুগধর্ম প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। তার কারণ রীতিগত বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য অর্থাৎ চিরাচরিত ছন্দোরীতি বা মিটারের অব্যবহার যা অত্যন্ত চমকপ্রদ। সাধারণত পদ্যছন্দ একটা বিশেষ আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই আদর্শ থেকে মুক্ত করে

গদ্য-কবিতার মধ্য দিয়ে সাহিত্যে নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত। তাই পরিশেষে বলা যায় যে, ‘পুনশ্চ’ কাব্যে যে ছটি কবিতা আমরা চিঠির রূপান্তর হিসেবে পেয়েছি তাতে একদিকে যেমন চিঠির আস্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি কবিতার মহিমান্বিতও প্রকাশ পেয়েছে যা বাংলা সাহিত্যে অভিনব ও চমকপ্রদভাবে ফুটে উঠেছে।

Reference:

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ২৯, ৮ বৈশাখ, ১৩৩৪, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ৭৪
২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ১৩১, ৮ বৈশাখ, ১৩৩৪, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ২০০
৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নাটক’ কবিতা, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৩৫
৪. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ১৩১, ৮ বৈশাখ, ১৩৩৪, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ২০১.
৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নাটক’ কবিতা, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৩৬
৬. ঐ
৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ভূমিকা’, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৩৫
৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ১৩১, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ২০১
৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পত্র’, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১,প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৪১
১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ১২৮, সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ২০১
১১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘পত্র’, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা-১৭, পৃ. ২৪১
১২. দাশ, শিশিরকুমার, ‘গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব’, ১৩৯২ বৈশাখ ১, সুধাংশু শেখর দে, ‘দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩
১৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘নিজের কথা’, পত্র ১৯১ , সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ১৩
১৪. ঐ
১৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, ‘ফাঁক’, ‘পুনশ্চ’ কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৪১
১৬. দাশ, শিশিরকুমার, ‘গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব’, ১৩৯২ বৈশাখ ১, সুধাংশু শেখর দে, ‘দে’জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩

১৭. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নিজের কথা', পত্র ১২২ , সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ১৯৬

১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'সুন্দর', 'পুনশ্চ' কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৫১

১৯. দাশ, শিশিরকুমার, 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব', ১৩৯২ বৈশাখ ১, সুধাংশু শেখর দে, 'দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩

২০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'নিজের কথা', পত্র ১২৪ , সম্পাদনা অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, প্রকাশ ২২ শ্রাবণ, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩, পৃ. ১৯০

২১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বিচ্ছেদ', 'পুনশ্চ' কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৫৪

২২. ঐ

২৩. ঐ

২৪. ঐ

২৫. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'গ্রন্থপরিচয়', 'পুনশ্চ', রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ৭১১

২৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, 'বাসা', 'পুনশ্চ' কাব্য, রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭, পৃ. ২৫৪

Bibliography:

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'পুনশ্চ', রবীন্দ্র-রচনাবলী (বিশ্বভারতী সুলভ সংস্করণ), অষ্টম খণ্ড, মাঘ ১৪২১, প্রকাশক শ্রীরামকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা-১৭

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নিজের কথা', সম্পাদনা- অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, ১৪১৮, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা: লি:, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কল-৭৩

শিশিরকুমার দাশ, 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব', ১৩৯২ বৈশাখ ১, সুধাংশু শেখর দে, 'দে'জ পাবলিশিং, ১৩ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট, কল-৭৩